এক বালকের দেখা ডক্টর জোহা

খন্দকার জাহিদ হাসান

(১)

রাজশাহী বেতার কেন্দ্রের ঠিক উল্টোদিকেই আমাদের পাড়া। এই পাড়ার তেরাস্তার মোড়ের কাছে অবস্থিত দশ-পনের বিঘের এক ফালি জমিতে বেশ ক'টি ফলের গাছ ছিল। একপাশে ছিল দু'টো বাতাবী লেবুর গাছ (দু'টো গাছই পরে মারা গিয়েছিল) ও একটা পেয়ারা গাছ। এছাড়াও জমিটার ঠিক মাঝখানটায় একটা আমগাছ আর একটা জামগাছ জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়েছিল। গাছ দু'টো ছিল বেশ বড় বড়। দূর থেকে দেখলে মনে হ'ত যেন একটামাত্র বিশাল গাছ দু'পায়ের উপর ভর ক'রে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রাচীরবিহীন এই জমিটির আসল মালিককে আমরা কখনোই চোখে দেখিনি। তবে আমার এক ছেলেবেলার বন্ধু বুলুর বাবা জায়গাটার দেখাশোনা করতেন। একদিন বুলু আমাদেরকে বল্‌ল, ''বুঝলি, এই জমিটা আমার মামার। উনার নাম ডক্টর শামসুজ্জোহা।''

আমি জিজ্ঞেস করলাম, ''তোর মামা ডাক্তার নাকি?'' বুলু জবাব দিল, ''না, ডাক্তার হবেন কেন? উনি অন্য কি যেন একটা বিষয়ের উপর 'ডক্টর'। রাজশাহী ইউনিভার্সিটির টিচার। মাঝে মাঝে দামী দামী চকোলেট আর কেক নিয়ে আমাদের বাসায় বেড়াতে আসেন। জোহা মামা খুব ভাল!''
''তো তোর মামা এই জমিটার উপর বাসা তৈরী করেন না কেন?''
''আব্বা প্রায়ই মামাকে বাসা বানাতে বলেন। কিন্তু মামা বলেনঃ পরে দেখা যাবে দুলাভাই। আর মা যদি বলেনঃ তোর গাছের ফলগুলো সব বারোভূতে খাচ্ছে। আমরা আর সামলাতে পারি না বাপু! জোহা মামা শুধু হাসেন আর বলেনঃ খাক্ না আপা। গাছের ফল তো খাওয়ার জন্যই। কেউ একজন খেলেই হ'ল!''
একদিন এক বিয়ের বাড়ীতে এই ডক্টর জোহাকে দেখার সুযোগ হ'য়ে গেল আমাদের।

সেটা ছিল ১৯৬৭-৬৮ সালের দিকের কথা। বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে তখনকার দিনে ব্যাঙের ছাতার মত চারিদিকে এত 'কম্যুনিটি সেন্টার'-এর ছড়াছড়ি ছিল না। বিয়েশাদীর মূল অনুষ্ঠানের আয়োজন সাধারণতঃ কনের বাবা-মা'র বাসাতেই করা হ'ত।

আমাদের পাড়াতে এক সুন্দর সন্ধ্যায় এমনি এক বিয়ের অনুষ্ঠান চলছিল। আমার সেই ছেলেবেলার বন্ধু বুলুর বড় বোনের বিয়ে ছিল সেটা। দেবদারুর পাতা আর রঙীন কাগজের ঝালরে সাজানো চমৎকার 'গেট' এবং অপূর্ব আলোকসজ্জায় সারা বিয়েবাড়ী ঝলমল করছিল। বাড়ীর এক কামরায় তারঃস্বরে গ্রামোফোনে গান বাজছিলঃ ''ঝড় উঠেছে, বাউল বাতাস..... ॥'' কিংবা ''মধুমালতী ডাকে আয়..... ॥''

বরযাত্রী তখনো এসে পৌঁছায়নি। বরের আগমনে বিলম্ব, কনের অভিভাবকদের উৎকণ্ঠা,ইত্যাদি বাংগালীর বিয়ের অনুষ্ঠানে এক চিরন্তন ব্যাপার। অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ের সাথে আমিও দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করছিলাম। রঙীন বেলুন আর আতসবাজীর আকর্ষণ ছিল সবচেয়ে বেশী। কিন্তু সেই সাথে চারিদিকের কোনোকিছুই আমাদের নজর এড়াচ্ছিল না। যে-কোনো মন-কেড়ে-নেওয়া ভিন্নধর্মী ঘটনা বা দৃশ্যের জন্যই আমরা সবাই উন্মুখ হ'য়ে ছিলাম। আমাদের সাথে বুলুও ছিল।

বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না আমাদের। হঠাৎ সশব্দে কুকুরের লড়াই শুরু হ'য়ে গেল। বিয়েবাড়ীতে কুকুরের লড়াই, সাজানো গেটে বরপক্ষের সাথে কনেপক্ষের দর কষাকষি, কিংবা দু'পক্ষের অভিভাবকদের মধ্যে মন কষাকষি-এগুলো অতি পরিচিত দৃশ্য ও সাধারণ ঘটনা।

কুকুরের লড়াই শুরু হ'তেই কোত্থেকে যেন আমাদের পাড়ার 'রেন্টু পাগলা' এসে জুটলো। রেন্টু আসলে ঠিক পাগল ছিল না। সে ছিল মানসিক প্রতিবন্ধী। তবু পাড়ার সবাই তাকে পাগল ব'লেই জানত। দিনভর একা একা সে নিজের সংগে নিজেই কথা বলত,হাসত, আবার ঝগড়াও করত। তবে আকাশে হেলিকপ্টার দেখা দিলে, মুহররমের ঢোলের শব্দ শোনা গেলে কিংবা কুকুরের লড়াই বাধলেই রেন্টু বেরিয়ে আসত, আর পাড়াময় দাপাদাপি চেঁচামেচি ক'রে তার উল্লাস প্রকাশ করতে থাকত। পাড়ার যে-কোনো মিলাদ বা বিয়ের অনুষ্ঠানে এবং ঈদের জামাতে রেন্টু সবার আগে হাজির হ'ত।

যাই হোক, কুকুর-লড়াইয়ের দমক ক'মে আসতেই বাচ্চারা সবাই এবার রেন্টুকে নিয়ে মেতে উঠল। আমি নিজে অবশ্য কখনোই ওকে উত্যক্ত করতাম না। বরং আমার প্রিয় বিষয় ছিলঃ গভীর আগ্রহ ও অখন্ড মনযোগের সাথে রেন্টুর বিভিন্ন কার্যকলাপ ও ভাবান্তর লক্ষ্য করা।

রেন্টুকে নিয়ে সকলে এতই মশ্‌গুল ছিল যে, ওদিকে আরেকটি মজার ব্যাপার সবার অলক্ষ্যে যে শুরু হ'য়ে গেছে, তা কেউ খেয়াল-ই করেনি। ব্যাপারটি আমিই প্রথমে টের পাই। নারীকণ্ঠের 'বিলেতী ইংরেজী' কানে যেতেই ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলাম যে, কিছু দূরে এক শ্বেতাংগিনী 'মেম সাহেব' রেন্টুর দিকে তাঁর আংগুল নির্দেশ ক'রে তাঁর পাশেই দাঁড়ানো স্যুট্-টাই পরা এক কেতাদুরস্ত ভদ্রলোককে বেশ উৎকণ্ঠার সাথে কি যেন জিজ্ঞেস করছেন। আর সেই ভদ্রলোকও হাসিমুখে অত্যন্ত বিনয়ের সংগে মেম সাহেবকে কিছু একটা ব্যাখ্যা করছেন।

এই ফাঁকে আমাদের এই 'মেম সাহেব'-এর সামান্য পরিচয় দেওয়া যাক। আমাদের পাড়াতে এক পুকুরপাড়ে ইটের তৈরী বিরাট এক লাল রঙের পুরাতন বাসা ছিল। সেই রহস্যঘেরা বাসাতে এই শ্বেতাংগিনী ভদ্রমহিলা ও তাঁর স্বামী বাস করতেন। স্বামী ভদ্রলোকটি ছিলেন রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের তখনকার দিনের নামকরা সার্জন ডাঃ ইমদাদুল হক খান বা সংক্ষেপে ডঃ আই,এইচ,খান। ভদ্রমহিলা ছিলেন সম্ভবতঃ ইংরেজ। নিশ্চয় সেই সন্ধ্যায় তাঁরাও বিয়ে বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হ'য়েছিলেন।

যাই হোক, আমি সকলকে 'মেম সাহেব'-এর কথা জানাতেই এবার ছেলেমেয়ের দল রেন্টুকে ছেড়ে তাঁর কাছাকাছি স'রে এল। বুলু আমার কানে কানে বল্‌ল, ''মেমের সাথে যিনি কথা বলছেন, তিনিই জোহা মামা! কথাগুলো শোনা দরকার।''

বলাই বাহুল্য যে, বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা শোনার পরও আমরা উনাদের আলোচনার বিষয়বস্তু কিছুই ধরতে পারলাম না। অত কম বয়সে বড়দের কথার মর্মার্থ বোঝা আমাদের সাধ্যের বাইরে ছিল। তার উপর আবার তাঁদের আলোচনা চলছিল খাস্ ইংরেজীতে!

তবু হাল ছেড়ে না দিয়ে অনেকক্ষণ ধ'রে আমরা তাঁদেরকে পর্যবেক্ষণ করতে থাকলাম। ডক্টর জোহার কিছু কিছু কথায় মেম সাহেব হেসে উঠছিলেন। আবার মাঝে মাঝে তাঁর কথার মৃদু প্রতিবাদও করছিলেন ব'লে মনে হ'ল। যা হোক, এতকাল পরে এখন এই পরিণতঃ বয়সে তাঁদের সেই আলাপচারিতার একটা কল্পিত রূপ দাঁড় করালে নিশ্চয় তাতে কারো আপত্তি থাকার কথা নয়ঃ

মেম সাহেব (মিসেস আই, এইচ, খান)ঃ আচ্ছা, ওখানে ঐ মানসিক প্রতিবন্ধী ছেলেটাকে বাচ্চারা সবাই ওভাবে বিরক্ত করছে কেন, বলতে পারেন?
ডক্টর জোহাঃ আমার মনে হয় বাচ্চারা ওকে ঠিক বিরক্ত করছে না, আসলে ওর উপস্থিতিটা একটু উপভোগ করছে মাত্র।

মেম সাহেব (হেসে)ঃ আপনি কিন্তু বেশ সুন্দরভাবে বাচ্চাদের পক্ষে ওকালতি করলেন ডক্টর! তবে আমার অনুমান, তারা ওকে বিরক্তই করছে।

ডক্টর জোহাঃ হ'তে পারে। তবে ও নিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না মিসেস খান।

মেম সাহেবঃ আচ্ছা, ওর নাম কি যেন? ছেলেটাকে দেখাশোনা করার জন্য কেউ নেই নাকি?
ডক্টর জোহাঃ যদ্দূর মনে পড়ে ওর নাম 'সেন্টু' বা 'মিন্টু'- এই জাতীয় কিছু একটা হবে। শুনেছি ওর বাবা-মা নেই। এখন সে তার বড় ভাইদের কাছেই মানুষ হচ্ছে। তাঁরা ওকে যথেষ্ঠ দেখাশোনা করেন ব'লেই জানি। তবে সারাক্ষণ ওকে সংগ দেওয়ার মত অত সময় তো থাকার কথা নয় তাঁদের।

মেম সাহেবঃ ডক্টর জোহা, ঐ দেখুন মিন্টো ক্ষেপে গিয়ে খুব চেঁচামেচি করছে। আপনি কি মিন্টোর কাছ থেকে বাচ্চাদেরকে একটু স'রে যেতে বলবেন?
ডক্টর জোহাঃ চিন্তার কোনো কারণ নেই। ঐ দেখুন, বাচ্চারা নিজেরাই মিন্টুকে ছেড়ে এবার আমাদের এদিকে স'রে আসছে।
মেম সাহেবঃ তাইতো দেখছি!

ডক্টর জোহাঃ সে যাক্‌গে। এবার বলুন, আপনার স্বামী এলেন না যে বিয়ে বাড়ীতে?
মেম সাহেবঃ উনি সব সময় ব্যস্ত থাকেন রুগীদের নিয়ে।

ডক্টর জোহাঃ তো বিয়ে বাড়ী কেমন লাগছে আপনার?
মেম সাহেবঃ ভালোই তো! এদেশের কোনো বিয়েতে এটা আমার দ্বিতীয় বার আসা। আগের বারেরটা ছিল ঢাকাতে। সেবার বিয়ে খাওয়ার পর খুব পেট খারাপ হ'য়েছিল আমার। বেশ তৈলাক্ত ও ঝাল ছিল ওদের খাবারটা। আমার স্বামী ব'লেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের সব বিয়ে বাড়ীতেই নাকি এই ধরণের খাবার পরিবেশন করা হয়। তাই এবার বাসা থেকে খেয়েই এসেছি।

ডক্টর জোহাঃ খুব ভালো ক'রেছেন মিসেস খান!
মেম সাহেবঃ আমাদের ইংল্যান্ডে কিন্তু বিয়ের অনুষ্ঠানে এ ধরণের খাবার দেওয়া হয় না।

ডক্টর জোহাঃ জানি। পাশ্চাত্যের দু'একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাওয়ার সৌভাগ্য আমারও হ'য়েছিল।
মেম সাহেবঃ ও হ্যাঁ, তাই তো! আমি তো ভুলেই গিয়েছিলাম যে, আপনি পাশ্চাত্যে পি,এইচ,ডি, করতে গিয়েছিলেন! তো ঠিক কোথায় যেন গিয়েছিলেন?.....

আমার মনে হয় আমাদের কল্পনার ঘোড়াটির রাশ এখানেই টেনে ধরাটা শোভন হবে।

(২)

১৯৬৯ সাল। বাংলাদেশের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য বছর। পাকিস্তানের স্বৈরাচারী আয়ুবশাহীর বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থানের বছর। এই গণ-অভ্যুত্থানই স্বাধীন বাংলার পটভূমি তৈরী করে।

তারিখটা ছিল ১৮ই ফেব্রুয়ারী, মংগলবার। আমাদের বাসা থেকে সোয়া মাইল দূরে অবস্থিত রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। বাবার দেওয়া রিক্সা ভাড়ার পয়সা প্রায়ই খরচ ক'রে ফেলতাম আইস্‌ক্রীম, চকোলেট কিংবা ঝালমুড়ি কিনে। ফলে মাঝে মাঝেই গোপনে হেঁটে স্কুলে যেতে হ'ত।

সেদিনও গুটি গুটি পায়ে স্কুলে যাচ্ছিলাম। চারিদিকে অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করলেও তা আমার মনে কোনো রেখাপাত করেনি। বালক হওয়ার এই এক ভালো দিক! হাঁটতে হাঁটতে বামে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ছাড়িয়ে গেলাম। এরপর ডানে সদর হাসপাতাল ও বামে কয়লাচালিত পুরাতন পাওয়ার হাউজ পেরিয়ে শেষ পর্যন্ত একটা পুকুরের কাছে গিয়ে পৌঁছালাম। পুকুরপাড়ের তেঁতুলগাছের তলা দিয়েই স্কুলে যাওয়ার শর্টকাট্। ঐ তেঁতুলগাছ থেকে মাত্র একশ' গজের মধ্যেই প্রথমে রাজশাহী কলেজ ও তারপর আমাদের কলেজিয়েট স্কুল। তারও পরে হ'ল সাহেব বাজার।

যাই হোক, তেঁতুলতলার শর্টকাট্ আর মারা হ'ল না আমার। দেখলাম অসংখ্য মানুষ পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে উৎসুক চোখে কলেজের দিকে তাকিয়ে আছে। এক ভদ্রলোক আমাকে উদ্দেশ্য ক'রে চেঁচালেন, ''এই যে খোকা, চারিদিকে এত গন্ডগোল, আর এর মধ্যে তুমি যাচ্ছ স্কুলে? দেখছ না- সারা কলেজ, স্কুল আর বাজার এলাকায় মিলিটারী নেমেছে? যাও, বাসায় ফিরে যাও!'' আরেকজন বল্‌ল, ''শুনেছি, ইউনিভার্সিটিতেও নাকি প্রচূর মিলিটারী নেমেছে।''

মনে মনে বাসাতেই ফিরে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। কিন্তু তার আগে 'দেখি না কি হয়' করতে করতে কেটে গেল কয়েক মিনিট। দেখলাম, খাকী পোষাক পরা অনেক মানুষ বন্দুক হাতে রাস্তায় টহল দিচ্ছে। অনুমান করলাম, এরাই মিলিটারী।

কলেজের ভেতরের দিক থেকে নানা ধরণের শ্লোগান ভেসে আসছিল। মনে হ'ল তার আওয়াজ ধীরে ধীরে বাড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ছাত্রদের বিশাল মিছিল কলেজ কম্পাউন্ড থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামতে শুরু করল। বেশ জংগীই ছিল সেই মিছিল।

এরপর আর দেখাদেখির কিছু ছিল না। মিলিটারীরা প্রচন্ড গোলাগুলী আরম্ভ ক'রে দিল। আমরা যারা এতক্ষণ পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে 'দেখি না কি হয়' করছিলাম, এবার তারা পেছন ফিরে 'পালা-পালা' করতে করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়াতে শুরু করলাম। স্বভাবতঃই আমি আমার নিজের মহল্লার দিকেই ছুটছিলাম। গোলাগুলীর শব্দ ক্রমেই ক্ষীণতর হ'য়ে আসছিল। এক সময় লক্ষ্য করলাম যে, আমি একা এবং আর দৌড়াচ্ছি না, বরং হাঁটছি।

একটা এ্যাম্বুলেন্স্ তারঃস্বরে সাইরেন বাজাতে বাজাতে রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দিকে চ'লে গেল। বাসার উদ্দেশ্যে ঐ একই দিকে হাঁটতে হাঁটতে যখন হাসপাতালের ইমার্জেন্সী বিভাগের গেটের কাছাকাছি পৌঁছে গেলাম, তখন আরেকটা এ্যাম্বুলেন্স্ শব্দ করতে করতে সেই গেট দিয়ে ঢুকছিল। আমি তার পেছনে দৌড়াতে দৌড়াতে এ্যাম্বুলেন্স্ দাঁড়ানোর জায়গাটিতে এসে হাজির হ'লাম। সেখানে বেশ কিছু লোকজন আগে থেকেই অপেক্ষা করছিল।

হাসপাতালের কর্মচারীরা এ্যাম্বুলেন্স্ থেকে ত্রস্তহাতে স্ট্রেচারে ক'রে একজনকে নামিয়ে দ্রুত ভেতরে নিয়ে গেলেন। সারা মুখ অসহনীয় ব্যথায় কুঁকড়ে যাওয়া এক ভদ্রলোক সেই স্ট্রেচারে শুয়ে ছিলেন। তাঁর পেটের কাছটায় ছিল রাশি রাশি তূলো ও ব্যান্ডেজের স্তুপ, যা চুঁইয়ে চুঁইয়ে রক্ত ঝরছিল। আমি পরিষ্কার টের পেলাম যে, স্ট্রেচারে শায়িত মৃত্যুপথযাত্রী ভদ্রলোক আমার পরিচিত। কিন্তু এর আগে তাঁকে ঠিক কোথায় দেখেছি, তা কিছুতেই স্মরণ করতে পারলাম না। তাই নিজের উপর ভয়ানক রাগ হচ্ছিল আমার।

হঠাৎ উপস্থিত লোকজনদের মধ্যে বিরাট এক গুঞ্জন উঠল, ''ডক্টর জোহা! ইনি তো রাজশাহী ইউনিভার্সিটির কেমিস্ট্রি বিভাগের রীডার!!'' এক নিমেষেই আমার মনে প'ড়ে গেল সেই স্মৃতিময় বিয়ে বাড়ীর হারানো দিনের কথা।
দুঃখভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম।

ঘন্টাখানেকের মধ্যেই সারা রাজশাহী শহরে মানুষের মুখে মুখে র'টে গেল এক নিদারুণ দুঃসংবাদঃ ডক্টর জোহা আর নেই! ইউনিভার্সিটি এলাকায় পাকিস্তানের বর্বর মিলিটারীরা তাঁকে বেয়োনেট চার্জ ক'রে ভয়ানকভাবে আহত ক'রেছিল। পরে তিনি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেছেন। কয়েকঘন্টার মধ্যেই এই সংবাদ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল। যতদূর মনে পড়ে, মিলিটারীরা সেদিন রাজশাহী কলেজের কাছেও কমপক্ষে দু'জন ছাত্রকে গুলী ক'রে হত্যা করেছিল।

ডক্টর জোহার মৃত্যু ঊনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানকে প্রচন্ড বেগবান ক'রে তোলে। আমরা সকলেই জানি যে, এই গণ-অভ্যুত্থানই পরে স্বৈরাচারী আয়ুবশাহীর পতনকে ত্বরান্বিত করে, যার ফলশ্রুতিতে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

উপসংহারঃ

আমাদের পাড়ার তেরাস্তার মোড়ের কাছে অবস্থিত ডক্টর জোহার সেই জমিটির মাঝখানে জড়াজড়ি ক'রে দাঁড়িয়ে থাকা সেই আমগাছ ও জামগাছ আজ আর নেই। কিন্তু জমিটি এখনও র'য়েছে। এখন তার চারিদিকে র'য়েছে শক্ত ইটের এক মজবুত বেষ্টনী-প্রাচীর।

ডক্টর জোহা আজ আর আমাদের মাঝে নেই। কিন্তু রাজশাহী ইউনিভার্সিটি আজও র'য়ে গেছে। আরো র'য়েছে লাখো প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ। সার্বভৌমত্বের সুদৃঢ় এক অদৃশ্য প্রাচীর অনুক্ষণ সযত্নে রক্ষা ক'রে চ'লেছে সেই স্বাধীনতা!

[পুনশ্চঃ আমাদের পাড়ার 'রেন্টু' নামের সেই মানসিক প্রতিবন্ধী ভদ্রলোক গতমাসে (জানুয়ারী,২০০৬) ধরাধাম ত্যাগ ক'রেছেন।]

সিড্‌নী,
১৭/০২/২০০৬।